বঙ্গবন্ধু ও রাসেলের গল্প

বঙ্গবন্ধু ও রাসেলের গল্প

খালেক বিন জয়েনউদদীন

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

Bangabandhu O Raseler Golpo by Khaleque Bin Zainuddin
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2021

Price : 250.00
US $ 15

ISBN 978 984 95481 0 2

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

আমার বাবা আলহাজ মো. জয়েনউদদীন
যিনি আজীবন বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন
আমার জন্মদাত্রী সাজেদা খাতুন
যিনি একাত্তরে আমাদের যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন
আমার দাদিমা মাজেদা খাতুন
যিনি আমার শৈশব-কৈশোরের প্রিয়তমা ছিলেন
এবং
বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস-প্রণেতা
আমার প্রিয় সম্পাদক ও গবেষক ড. মোহাম্মদ হাননান
খালেক

প্রসঙ্গ-কথা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতির পিতা। একমাত্র তাঁর এবং এ দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফসল স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। ছাত্রজীবন থেকে তিনি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ১৪টি বছর পাকিস্তানি বন্দিখানায় কাটিয়েছেন। একাত্তরে তাঁকে ফাঁসির দ াদেশ দেওয়া হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন স্ব-শাসন ও বাঙালি গোত্রের মহানায়ক। ঔপনেবেশিক শাসনব্যবস্থার মূলে তিনি কুড়াল মেরেছিলেন। স্বদেশকে মুক্ত করেছিলেন পাকিদের হাত থেকে। আজকের বাংলাদেশেরই স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। তাঁর জীবন কখনো কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। পরাশক্তি ও দেশীয় বিভীষণদের চোখেমুখে চুনকালি মাখিয়ে তাঁর বাঁচতে হয়েছে। আবার তারাই তাঁকে হত্যা করেছে সপরিবারে। নিকট আত্মীয়স্বজন, নিরাপত্তাকর্মী ও মোহাম্মদপুরের নিরাপরাধ মানুষকেও বঙ্গবন্ধুর খুনিরা একই সময়ে হত্যা করে। এই হত্যাকা ে অনেক শিশু-কিশোর মারা যায়। এদের মধ্যে রাসেল, বেবী, আরিফ, সুকান্ত, রিন্টু ও মোহাম্মদপুরের বস্তিঘরের নাসিমা বিশেষভাবে উলে- খ্য। তাঁর এবং আগস্টের আত্মোৎসর্গকারীদের প্রাণদানে বাংলাদেশ আরও সজীব হয়েছে। একাত্তরের রক্ত বৃথা যায়নি। কিন্তু পঁচাত্তর থেকে আমরা কী দেখেছি? খুনি মোশতাক, জিয়া, ফার ক-রশীদ, খালেদা-এরশাদ দেশটাকে হঠাৎ পাকিস্তানে বানিয়ে ফেলেছিল। তখন বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতাকামী মানুষেরা ছিল বেড়াজালে আবদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা নির্বাসন থেকে ফিরে দেশের মানুষকে উদ্ধার করেন। প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষের অধিকার। বিচার হয় একাত্তর-পঁচাত্তর-সহ সকল ষড়যন্ত্রমূলক মানুষ হত্যার।

বঙ্গবন্ধু বাঙালির আকাশের নক্ষত্ররাজ এবং গোটা বিশ্বে

নন্দিতনেতা। একটি দেশ ও একটি জাতি তথা বাঙালি কওমের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর আত্মত্যাগ অপরিসীম। তিনি ছিলেন জাতিগোত্রনির্বিশেষে সকল মানুষের প্রিয়জন। শত্র কে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু শত্র রা তাঁকে বাঁচতে দেয়নি। প্রাণদানেই বঙ্গবন্ধু অমরত্ব লাভ করেছেন। শতবর্ষের আলোয় তাঁর পয়দায়েশ ও কীর্তিগুলো জ্বলজ্বল করছে। তাঁর স্বপ্নের আলোয় আমরা প্রতিদিন পথ চলছি। তাঁর চিন্তা-চেতনা ও আদর্শ আমাদের শক্তি-সাহস এবং সুপথ দেখায়।

বঙ্গবন্ধু ছোটোদের ভাষণ ভালোবাসতেন। দলীয় কর্মীদের বাড়িতে গেলে ছোটোদের জন্য উপহার নিয়ে যেতেন। শিশুদের সংগঠনের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। কচি-কাঁচার মেলা ও খেলাঘরের অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। জীবনের শেষ জন্মদিনটি এদের সাথেই কাটিয়েছেন। সংবিধানে শিশুর অধিকার সংরক্ষণ করেছেন জাতিসঙ্গের শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হওয়ার অনেক পূর্বে। ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রবর্তন করেছেন। বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠিত হলে এর শিশু-কিশোর বিভাগ না থাকায় বঙ্গবন্ধু গঠনতন্ত্রে শিশু বিভাগটি পুনঃসংযোজনের লক্ষ্যে রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই ও ড. আবদুল াহ-আলমুতীকে দিয়ে খসড়া প্রস্তাব ও নিয়মনীতিগুলো প্রণয়ন করেন। কিন্তু তা বঙ্গবন্ধুর হত্যার কারণে কার্যকর হয়নি।

এই গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধুর শিশুদের প্রতি দরদ, শিশুদের সুরক্ষা, অধিকার তথা মৌলিক বিষয়গুলোর ধারণা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর শৈশব ও কৈশোরের কিছু সত্য ঘটনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত এগুলো তাঁর জীবনেরই অংশ। রাসেলের প্রসঙ্গটি এসেছে শিশু অধিকারের বিষয়টি বর্ণনার মধ্যে। রাসেল একজন শিশু বা কিশোর ছিল। তার বাঁচার অধিকারকে স্টেনগানের গুলি দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। আজও গোটা বিশ্বে শিশুর সুরক্ষা নেই। আমাদের উত্তরসূরিদের মৌলিক অধিকার নানাভাব ক্ষুণ্ন। শিশুরা নানাভাবে নির্যাতিত। অকালে তারা সভ্য মানুষের দ্বারা প্রাণ হারায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা না হয় নাই বললাম। আসলে আমরা মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই শিশুদের সকল

অধিকার রক্ষা করা উচিত। কিন্তু আমরা তা রক্ষা করতে পারিনি। বিশ্ব শিশুদিবসে আমরা গলা ফাটিয়ে শিশুর অভাগের কথা বলি। মৌলিক চাহিদা পূরণ করব এমন প্রতিজ্ঞা করি। গোটা বিশ্বেই শিশুর আজ অসহায়। আসুন আমরা আমাদের সন্তানদের যথাযথভাবে লালনপালন করি এবং তাদের পক্ষে দাঁড়াই।

খালেক বিন জয়েনউদদীন
৯৭, পূর্ব রাজাবাজার, ঢাকা
তারিখ : ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২০

সূচিপত্র

মায়ের মতো দেশটি আমার ১১
রাসেল ও বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমি ১৫
খোকার পূর্বপুরুষ ও শৈশব-কৈশোর ১৮
মাঘ মাসের কোনো একদিন ২২
মাদারীপুরে খোকা ২৫
হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ ২৮
কিশোর শাহজাহান ও বঙ্গবন্ধু ৩২
বঙ্গবন্ধুর প্রথম বিজয় ৩৫
মুজিব ও কিশোর আনোয়ার ৪১
শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা ৪৬
বিশ্ব শিশুদিবস : শিশুর সুরক্ষা ৫০
শিশু অধিকার : শিশুর প্রাণসংহার ৫৪
শিশুদের প্রিয় দিন ৫৮
শিশু অধিকার : কন্যাশিশুদিবস ৬২
পরাগের ফিরে আসা ৬৬
রাসেল : মমতামাখা একটি নাম ৬৯
শিশু অধিকার ও শেখ রাসেল ৭৬
রাসেলের কইতর ৭৯
জলের বন্ধু রাসেল ৮২
ভরা থাক স্মৃতি সুধায় ৮৬
মানুষ হত্যার বিচার ৯৮
শেখ রাসেলের জীবনপঞ্জি ১১১
বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি ১১৩
জীবন থেকে শিশুর শিক্ষাগ্রহণ ১২৭

মায়ের মতো দেশটি আমার

যেদিকে তাকাই, সেদিকেই সবুজ আর সবুজ। এত সবুজ বুঝি পৃথিবীর কোনো দেশে নেই। আমাদের এই দেশটির নাম বাংলাদেশ। এক সময় বলা হতো বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালা দেশ। বাংলা নামটা কোত্থেকে এলো? সম্রাট আকবরের নবরত্ন সভার সদস্য আবুল ফযল তার আইন-ই আকবরী গ্রন্থে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল যুক্ত হয়ে বাঙ্গাল বা বাঙ্গালা হয়েছে। আল শব্দের অর্থ বোঝানো হয়েছে খেতের আল বা ছোটো-বড়ো বাঁধ। বাংলাদেশ খেতখামার আর জল-বৃষ্টির দেশ। তাই আল বেশি বলেই এ দেশের নাম হয়েছে বাঙ্গালা বা বাংলাদেশ।

আমাদের বাংলাদেশ ভূখণ্ড অসংখ্য নদীবিধৌত এবং নিম্নবদ্বীপ এলাকা। মোট আয়তন ৫৫,১২৬ বর্গমাইল। সমুদ্র বিজয়ের পর আয়তন আরও বেড়েছে। তিনদিক ভারতদ্বারা বেষ্টিত। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কিছুটা পার্বত্য এলাকা ছাড়া বাংলাদেশ প্রধানত সমতলভূমি। ভূপ্রকৃতি অনুসারে এ দেশের রয়েছে পাহাড়ি অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল ও নিম্ন-গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চল। এসব অঞ্চলে প্রবাহিত পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলি, সুরমা, ব্রহ্মপুত্র, মধুমতী, ইছামতী, করতোয়া, তিস্ড়া, ঘাঘোর আড়িয়াল খাঁ, কুশিয়ারা-সহ অসংখ্য ছোটো-বড়ো নদনদী। এ দেশের জলবায়ু

পুরোপুরি মৌসুমি। ছয়টি ঋতু এ দেশকে সজীব করে রাখে ঋতুবৈচিত্র্যে।

বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে মঙ্গোলীয়, তিব্বতীয়, দ্রাবিড় এবং আর্যজাতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। গারো, হাজং, সাঁওতাল, খাসিয়া, রাজবংশী, মুরং, খুমি, চাকমা, মগ, কুকি, বনযোগী, লুসাই, তিপরা, পাঙ্খে, ওঁরাও প্রভৃতি উপজাতীয়রা এ দেশে বসবাস করছে প্রাচীনকাল থেকে। বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল নাগরিকই বাংলাদেশের নাগরিক।

জন-অধ্যুষিত বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোর অন্যতম। অধিকাংশ মানুষ গ্রামবাংলায় বাস করে এবং তাদের মাতৃভাষা বাংলা। আর এ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মেরুদণ্ড হচ্ছে কৃষি। ফসল উৎপাদন করেই সিংহভাগ মানুষ জীবিকানির্বাহ করে। বাংলাদেশের সুন্দরবনের কথা আমরা সবাই জানি। বিশ্বখ্যাত এ বনের বাসিন্দা রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

আজকের বাংলাদেশ প্রাচীন বাংলার একটি অংশমাত্র। সে সময় নানান জনপদে বিভক্ত ছিল। এসব জনপদের মধ্যে আমরা, বঙ্গ, গৌড় পুণ্ড্র, রাঢ়, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, সমতট, বরেন্দ্র, সুম, বজ্রভূমি, কঙ্কগ্রাম ও তাম্রলিপির কথা জানি। এসব জনপদে বিভিন্নজন শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। আবার বংশীয় রাজত্ব চালু ছিল দীর্ঘকাল। মৌর্য গুপ্ত রাজবংশ, পালবংশ ও সেনবংশ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। গুপ্ত রাজবংশের পরে অর্থাৎ ষষ্ঠ শতকে আমাদের এ অঞ্চল শাসন করেছেন গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব। এদের উপ-রাজধানী ছিল গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায়। এরপর ত্রিশ বছর রাজত্ব করেছেন শশাঙ্ক এবং খড়্গ, লোকনাথ ও রতিবংশের রাজরাজড়া। সেনবংশের পর এ দেশে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। সুলতানি ও মোগল আমলের কথা আমরা সকলেই জানি। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশি পতনের মাধ্যমে উপমহাদেশে প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন এবং পরে ইংল্যান্ডের রানির শাসনে চলে। অবশ্য

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে এ দেশের মানুষ ইংরেজদের বির"দ্ধে যুদ্ধ করে। সে যুদ্ধ সিপাহিযুদ্ধ বা প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ। এ যুদ্ধ কিন্তু সফল হয়নি। অনেক মানুষ সে যুদ্ধে শহিদ হন। অনেকে সীমাহীন অত্যাচার-নিপীড়ন ভোগ করেন। এরপর একশো বছর ধরে এ দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ সংগ্রাম, আন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ-বে যোগ দিয়েছেন। অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন।

সিপাহিদের যুদ্ধ বা প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধের (১৮৫৭) পূর্বে এ দেশে ফকির ও সন্ন্যাস বিদ্রোহ (১৭৬০–১৮০০), কৃষক বিদ্রোহ (১৭৯৩–১৮৩৩), ওয়াহাবি ও ফরাজি বিদ্রোহ (১৮৩১–১৮৫৭) এবং সিপাহি বিদ্রোহের পরে নীল ও কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল ১৮৫৯ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে। আমাদের দুর্ভাগ্য কোনো বিদ্রোহ বা যুদ্ধে আমাদের দেশ শত্র"মুক্ত হয়নি।

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী শ্রমিকদল ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার সিদ্ধান্ড় নেয়। আর এ কাজের জন্য লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের তেসরা জানুয়ারি ইংরেজ সরকার ক্ষমতা হস্ড়ান্ড়রের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এভাবে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ও ১৫ই আগস্ট ব্রিটিশ ভারত দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্ড়ান ও ভারত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আমাদের পূর্ববঙ্গ পাকিস্ড়ানের অন্ড়র্ভুক্ত হয় এবং নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্ড়ান। তখন এ অঞ্চলের মানুষের কোনো অভাব ছিল না। প্রচুর ধান, পাট, তামাক, চা উৎপন্ন হতো। চামড়াও বিদেশে রপ্তানি করা হতো। এসব রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্ড়ানের উন্নয়নের জন্য। তখন পূর্ব বাংলার মানুষ বুঝল তাদের ঠকানো হচ্ছে। শোষণ করা হচ্ছে। আবার মাতৃভাষা বাংলার বির"দ্ধেও ষড়যন্ত্র শুর" হলো। ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে মহান ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে সেই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেয়া

হলো। বাংলার মানুষ জেগে উঠল স্বাধিকারের জন্য। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফা। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং সত্তুরের নির্বাচনে এ অঞ্চলের মানুষের দাবি আরও জোরালো হয়ে উঠল। কিন্তু পাকিস্ড়ানের শাসকবর্গ ছিল নিষ্ঠুর। তারা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে সমগ্র বাঙালি জাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হত্যা-নির্যাতন শুর" করল। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ২৬শে মার্চ ঘোষণা করা হলো স্বাধীনতা। শুর" হলো মুক্তিযুদ্ধ। ৯ মাস যুদ্ধ চলল। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ড় বিজয় অর্জিত হলো। সেই যুদ্ধে এ দেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণ হারাতে হয়েছে। ভারতও আমাদের সহযোগিতা করেছে। রাশিয়াও আমাদের পাশে ছিল।

আমরা বাংলাদেশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। এই মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যাঁরা প্রাণ উৎসর্গিত করেছেন, আমরা চিরকাল তাঁদের স্মরণ করব, শ্রদ্ধা জানাব। সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশ মায়ের আঁচলের মতো ছায়া দিক, চির অম□ান থাকুক আবহমানকাল। আর আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এ দেশটি পাকি হায়েনাদের হাত থেকে মুক্ত করতে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন এ দেশের স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর অগ্রজ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম, শামসুল হক এবং জাতীয় চারনেতাসহ অনেকে পরামর্শ-নির্দেশ, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে বঙ্গবন্ধুর ছোটো ছেলেটির নামই শেখ রাসেল। শেখ রিসালউদদীন খাতাপত্তরের নাম।

রাসেল ও বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমি

হিমালয়ের আদুরি কন্যে গঙ্গা। গঙ্গার মৃত্যু নেই। কতবার ভূমিকম্প হলো, পাহাড়ে ধস নামল, ঝড় বইল পর্বত-টিলায়, গঙ্গা আগের মতোই বইছে। কত জনপদের ওপর তার ভালোবাসার স্রোত, সেই স্রোতের ফল্গুধারায় বিকশিত ভারত-বাংলার ঘর-গেরস্থি।

গঙ্গা সেই আদিকালের ঐশ্বরিয়া। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কখনো স্বরূপ পালটায়নি। কিন্তু প্রাকৃতজনের আবাসভূমিতে নববধূর মতো ঘোমটা খুলে বারবার নতুন নাম ধারণ করেছে। নদী, খালবিল স্রোতধারায় এই রূপ কুমারীর নানা নাম। তাই বলে জননী হিমার দেওয়া 'গঙ্গা' শব্দটি কখনো বাদ পড়েনি।

হিমালয়ের তালপুথিতে নবগঙ্গা, কালিগঙ্গা, বুড়িগঙ্গা, বিজয়গঙ্গা, রামগঙ্গা, মহাগঙ্গা, আচনীগঙ্গা, গঙ্গালিয়া, গঙ্গাসাগর, সু-গঙ্গা, বুড়াগঙ্গা, গঙ্গাধর, ঋষিগঙ্গা, হনুগঙ্গা, পেনগঙ্গা, ওয়েনগঙ্গা, দামনগঙ্গা, গঙ্গাবলী ও দ্বিতীয় গঙ্গার নাম কুলুজি পাওয়া যায়। গঙ্গার জন্ম ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। রাজা সাগর, ইন্দ্র, কপিল মুণি, ভগীরথ ও মহাদেব-এর উৎস। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালেও তার অবাধ বিচরণ– এ কারণেই গঙ্গা আবার ত্রিপথগামী।

দ্বিতীয় গঙ্গার দুহিতা পদ্মাবতী রাতের অন্ধকারে বঙ্গের পশ্চিমকূলে প্রবেশ করে তার জানান দেয়। আজও পদ্মা প্রবাহিত।

কিন্তু মনুষ্যসৃষ্ট দেয়াল তার চলার গতিকে ক্ষীণতর করেছে। তার নাতনি মধুমতীও রূপযৌবনে বিগতা। তবু তার স্রোতধারা জলটলমলে ধাবিত। পাটগাতী হয়ে মধুমতী গেছে দক্ষিণে, আরও দক্ষিণে। হাজারো গাঁও-গেরাম ধুইয়ে সাগরে-মহাসাগরে। পদ্মাবতীর যুদ্ধবাজ এক সন্তানের নাম আড়িয়াল খাঁ। আড়িয়াল খাঁর একটি শাখা ভাঙ্গা-টেকেরহাট হয়ে বাইগ্যার বিলের মধ্যে পতিত হয়েছে। এই স্রোতধারার প্রাচীন রাজধানী কোতওয়ালী পাড়ায় বয়ে যাওয়া নাম ঘাঘোর নদী। এই ঘাঘোরও জল থইথই খেলায় মগ্ন থেকে মিশেছে পাটগাতীর মোহনায়। পশ্চিমে মধুমতী আর পূর্বে ঘাঘোর নদী। মাঝ বরাবর জলাভূমি। অনেকে এসেছে এই জলাভূমিতে টং পেতে থাকতে। তখন ছিল জলাভূমি। এক সময় জলাভূমি চারণভূমিতে পরিণত হলো। গোপালবাবুর হাজারো প্রজারা ছুটে এল টং বাঁধা গ্রামে। কেউবা এলেন কোতওয়ালী পাড়া থেকে, কেউবা খানজাহান আলীর মৌজা থেকে। টং থেকে টুঙ্গি, জনবসতি গড়ে ওঠার পর টুঙ্গিপাড়া।

টুঙ্গিপাড়ার ইতিহাস বেশি দিনের নয়। নীহার রঞ্জন রায় তাঁর একটি গ্রন্থে বলেছেন– এ অঞ্চল খাঁড়িতে জেগে ওঠা নতুন জলাভূমি। তবে টুঙ্গিপাড়ার কপাল ভালো– পূর্ব-পশ্চিমে দুটি নদী। মোহনা তার পাটগাতী। এক সময় পাটগাতীতে স্টিমার চলতো। তবে নদীবিধৌত বলে নৌকা ছিল গ্রামের সাধারণ মানুষ চলাচলের একমাত্র বাহন। রাসেল স্টিমারে চড়ে গ্রামের বাড়িতে আসত মায়ের সাথে।

পঞ্চাশ বছর আগে টুঙ্গিপাড়াকে আগলে রেখেছিল একটি খাল। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খালটিই ছিল চলাচলের জলপথ। পাটগাতী ও গোপালগঞ্জ কিংবা খুলনা যেতে হলে টুঙ্গিপাড়া থেকে চড়তে হবে গয়না বা একমাল্লাই বা দুমাল্লাই নৌকোয়। কে এই জলাভূমির টুঙ্গিপাড়ায় প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল, তা কেউ হলফ করে বলতে পারবে না। সেই পঞ্চাশ বছর আগে টুঙ্গিপাড়া ছিল একটি

ছোট্ট গ্রাম।

গ্রামবাংলার আর দু-দশটি গ্রামের মতোই তার প্রাকৃতিক পরিবেশ। সবুজ গাছগাছালি আর পাতা-পল্লবে ছাওয়া গ্রামটি। তাল, খেজুর, আমগাছ, গাবগাছের কোনো অভাব ছিল না। হিজলের ডালে বসে দোয়েল ডাকত। ঘুঘু বাসা বাঁধত তমালের ডালে। বাঁশঝাড়ে বিলের পাখিরা এসে রাতে আশ্রয় নিত, বাসা বাঁধত। বেতস বনে রাতে শোনা যেত ডাহুকের ডাক। কখনো পাটখেতে ঘুরে বেড়াত ধাড়ি শেয়ালেরা।